আত্মসম্মান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মসম্মান

সপ্তারী বাস থেকে নেমে গেল। এই স্টপেই সে নামে। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে কাউকে যেন খুঁজছে। শরঙ্কাল, এবং আকাশ নীল অর্থাৎ শরৎকালে যেমনটা হয়ে থাকে। ভ্যাপসা গরম আবার রাতের দিকে ঠান্ডা বাতাসের আমেজ। নাকে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বাসের ভিড়ে সে কাহিল। তখনই কে যেন বলল, পলার দোকানের দিকে গেল। ওখানে গেলে পাবেন। ওদিকটায় থাকতে পারে।

এই স্টপে পর পর কিছু চা-এর দোকান, ওষুধের দোকান, এমনকী চাউমিন, এগরোলের দোকানও আছে। বড়ো রাস্তা থেকে গাড়ি চলাচলের মতো পাকারাস্তা তার বাড়ির দিকে চলে গেছে। বাসস্টপ থেকে সে হেঁটেই বাড়ি ফেরে। মার স্কুল থেকে এতক্ষণ ফিরে আসার কথা। বাবার ফিরতে রাত হয়। বাবার ছোটাছুটিরও শেষ নেই। হুট করে দিল্লি, বোম্বাই, হায়দরাবাদ কখন যে কোথায় চলে যান, ইউনিয়নের নেতা হলে যা হয়। পেকমিশনের বিরুদ্ধে লড়ালড়ি শেষ। সব দাবিই সরকার মেনে নিয়েছে। লড়াই সার্থক। বাবা আজকাল খুবই প্রসন্নচিত্তে বেশ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরেন। সে বাড়ি ফিরলে কারও আর চিন্তা থাকে না। বাসস্টপে নামলে, সেও ভাবে বাড়ি পৌঁছে গেছে।

যা হয়, শৈশব থেকে সে বড়ো হয়েছে এই এলাকায়। মোড়ের সব দোকানিরাই বাবার দৌলতে তাকে ভালোই চেনে। সে বাস থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকিয়ে কী খুঁজছে তারা তাও বুঝতে পারে।

পলার দোকান সামনের খাটাল পার হয়ে দুটো কাঠের গোলাও পার হতে হয়। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পলার দোকান দেখা যায়। ইতস্তত রাস্তার কুকুর যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়—পলার দোকানের সামনেও কুকুরের ঘোরাঘুরি আছে। তবে তামাটে রঙের কোনো খোঁড়া কুকুর সেখানে নেই। বাসের চাকায় চাপা পড়ে কুকুরটার অর্ধেকটা পা উড়ে গেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। পায়ে ঘা, শুয়ে থাকলে নীল রঙের মাছির উপদ্রব, কেড়ে কুড়ে খাবার আর ক্ষমতাই নেই। ভালো করে হাঁটতে পারে না, দৌড়তে পারে না, তাকে দেখলেই কুঁই কুঁই করতে থাকে।

কেউ দিলে খায়, না দিলে গাছতলায় লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে।

সে কলেজ থেকে ফেলার সময় কুকুরটাকে একটা পাউরুটি খেতে দেয়। কলেজে বাবার সময় টিফিন ক্যারিয়ারের সব খাবারটাই খাইয়ে যায়। কোথায় যে ডুব মারল। আর তখনই কুঁই কুঁই আওয়াজ। পেছনে ফিরে দেখল গাছের গুড়ির আড়ালে মুখ বার করে তাকে দেখছে। তুই এখানে! বলেই কাছে ছুটে গেল। পাটা ফুলে গেছে, শরীর বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে, নড়তে পারছে না। কাল পরশু অথবা তারও পরে, একদিন সে ঠিক দেখতে পাবে কুকুরটা রাস্তায় মরে পড়ে আছে। তার ভিতরে খুবই কষ্ট হচ্ছিল—সে একটা পাউরুটি কিনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখের কাছে এগিয়ে দিল। লোকজন তামাশা দেখতেই ব্যস্ত। তার রাগ হচ্ছিল খুব।

অবশ্য সে জানে রাগ করে লাভও নেই। যেমন কেউ বলছিল, তোর এত নরম মন ভালো না রে সঞ্চারী। কেউ বলছিল, রাস্তার কুকুর রাস্তায় মরে পড়ে থাকে, তুই তাকে বাঁচিয়ে রাখবি সাধ্য কী! এরা কেউ কেউ পাড়ার দাদা কাকা, কেউ সমবয়সী, যেমন ‘কেউ বলেই ফেলল, তোর সঙ্গে বাড়িতেই নিয়ে যা। তুই একা থাকিস, মাসিমা খুশিই হবেন।

সে কারও কথার জবাব দিল না। রুটি খাওয়া হয়ে গেলে, সে বটুয়া খুলে কী দেখল। তারপর রাস্তার নেমে গেল। গাছপালা এখনও কিছু আছে, এই রাস্তার কিছু হাইরাইজ বিল্ডিংও উঠে গেছে। পাশের মাঠে গোলপোস্টের কাঠে দুটো কাক বসে আছে, পুকুর থেকে বণিকদের রাজহাঁসগুলি উঠে এসেছে। গলা তুলে রাজনন্দিনীর মতো হাঁটছে। তার মন কঠিন না নরম সে ঠিক বোঝে না, কুকুরটা খেতে পাবে না, না খেয়ে মরে যাবে ভাবতেই তার ভিতরে কিছু একটা তড়িৎ গতিতে প্রবাহিত হচ্ছিল, বোধবুদ্ধি এর নাম হতে পারে, অথবা মায়া, সে যাই হোক, কিছু একটা করা দরকার। মনে হতেই টিফিন বাক্সটা উপুড় করে দিয়েছিল কুকুরের মুখের সামনে। সেই থেকে চলছে।

তার সালোয়ার কামিজ আশ্চর্য রকমের সবুজ। সে লম্বা এবং তার অনায়াস বিচরণে কিছুটা মুগ্ধতা থেকে যায়। ফেরার সময় সবাই টের পায় সে ফিরছে। শ্যামলা রঙের মেয়ে সে, চোখ মুখে লাবণ্য থাকলেও সে যে দেখতে খুব ভালো না, এটা সে বোঝে। রাস্তায় সে চোখ নামিয়েই হাঁটে। কারও চোখে চোখ পড়ে গেলে তার অস্বস্তি হয়। সে ঠিক সময়ে না ফিরলে মা তার বড়ো উৎকণ্ঠায় থাকে। বার বার রাস্তায় চোখ-সঞ্চারী যদি ফেরে।

সে দূর থেকেই দেখল, গেটের মুখে সেই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িতে কি কেউ নেই। মা স্কুল থেকে না ফিরলে কোলাপসিবল গেটে তালা দেওয়া থাকে। তার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি থাকে, কেউ না থাকলেও অসুবিধা হয় না। লোকটা গতকালও ঠিক এভাবে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল। সে না বলে পারেনি, কাল আসবেন। বাড়িতে কেউ নেই। মা স্কুলে গেছে, ফেরেনি। বাবার ফিরতে রাত হয়।

এই একটা দোষ আছে তার। কেউ নেই' কথাটাই যথেষ্ট। মা বাড়ি কখন ফেরে, কি ফেরে না, বাবার ফিরতে রাত হয়, কেন যে বলতে গেল! সে সোজাসুজি বলে দিলেই পারত, আপনার এত আধুনিক ফিল্টার আমাদের লাগবে না। মণিপিসি রেখেছে বলে আমাদেরও রাখতে হবে তার কী মানে আছে!

কিন্তু সোজা কথা সোজা ভাষায় বলতে তার যে আটকায়। এখন ফিরে গিয়ে লোকটার সঙ্গে আবার বক বক করতে হবে। মা বাড়ি থাকলে ঠিক জানালায় দেখা যেত। কিংবা গেট খুলে নোকটা ভিতরে ঢুকে যেত। গেটে তালা দেওয়া, লোকটাই বা যায় কোথায়। মণিপিসিরও খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, বাড়ির ঠিকানা, গেরস্থের নাম-সহ লোকটাকে এখানে পার্সেল করে দিয়েছে। কাল মা-বাবা কেউ বাড়ি ছিল

বলে ফিরে গেছে, আজ ফের হাজির। সহজে এরা ছাড়বার পাত্র না। ছিনে জোঁকের মতো লেগে থাকার স্বভাব।

তার মন নিতান্তই ব্যাজার হয়ে গেল। কেন যে মণিপিসি পাঠাল!

আপনার পিসিমা যে বলল, অবশ্যই যাবেন। চিনি বউদিকে বলবেন, আমি রেখেছি। তারপর হাতের লম্বা বাক্সটার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আপনার মারও খুব ইচ্ছে কেনার। যা দিনকাল, জল খেয়ে পেটের অসুখ লেগেই থাকে। পেট ভুটভাট কত কিছু...।

ইস লোকটা কত খারাপ কথা কত সহজে বলে দিতে পারে। পেট ভুটভাট মানে তার পেটে ভুটভট শব্দ হচ্ছে-জলে নানারকম জীবাণুও এ-বাড়ির জল খাওয়ার অনুপযোগী— সে তো কোনো অসুবিধা ভোগ করে না। মা-বাবাও না। একবার অবশ্য তার জন্ডিস হয়েছিল। সে তো শুনেছে, কোনো কিছুতেই ভাইরাস আটকানো যায় না। অকারণ এই কেনাকাটা তার খুব একটা পছন্দও না। তবু লোকটা দাঁড়িয়ে থাকলে কী করা। কিছুতেই যাবে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে, তবু যাবে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে, তবু যাবে না। রাস্তার ধারে বাড়ি বলে এই এক উটকো ঝামেলা। কেউ না কেউ অনবরত দরজায় টোকা মেরে যাচ্ছে— চাই বেডকভার, চাই ভাঙা ছাতা সারানো, চাই বাঁশমতি চাল, চাই শুটকি মাছ। তারপরও আছে, কাগজ আছে মা, কাগজ। ইচ্ছে করলেই দরজা খুলে ভিতরে বসতেও বলতে পারে না। সে একা, কাজের মাসি কাজ করে চলে গেছে। পাশের বাড়ির জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে কেউ কেউ লক্ষও করছিল। সেই লোকটা আবার আজ।

পূজার মরসুম শুরু হয়ে গেছে।

কেনাকাটা থাকে অনেক। স্কুল থেকে ফেরার রাস্তায় হাতিবাগানে একবার ঢু মারবেই মা। বেশি কেনাকাটা থাকলে দেরি হতেই পারে। বাসে যা ভিড়! ব্যাগ ভরতি শাড়ি সায়া

ব্লাউজ, এটা তোর মণিপিসির, এটা তোর সেজপিসির জন্য কিনলাম, আত্মীয়স্বজনদের এই মৌকায় যতটা পারা যায় ফুটানি দেখানো।

আসলে ‘ফুটানি দ্যাখানো’ খুবই রেগে আছে বলে ভাবছে। সেও কম দিতে থুতে পছন্দ করে না। রমাদার জন্য কিনলে না মা। বরং সেই সুযোগ বুঝে কার কেনা হয়নি মনে করিয়ে দেয়। তারপর বাড়ি বাড়ি যাওয়ার মধ্যেও কম আনন্দ থাকে না। তার যে মেলা মাসিপিসি। কাকিমা জেঠিমা। বড়োমামা মেজমামা, রনোদি, মা’র বোনঝি বোনপোও কম নেই। সুতরাং পূজার মরসুমে স্কুল সেরে কেনাকাটা যতটা পারে এগিয়ে রাখে মা। কখনো বাড়ি থাকলে সেও যায়। সেও কাকাকাকিমাদের জামাকাপড় পছন্দ করে কেনে। না গেলেও মা বাড়ি ঢুকেই চেঁচাতে শুরু করবে, সপ্তারী কোথায় রে! এই দ্যাখ তো, কী রকম হল, তোর দুদুমণির শাড়ি।

চারপাশে তার এত আছে, তবু এই অবেলায় কেন যে মনে হল তার কিছুই নেই। রাস্তার কুকুরের মতোই সে এই সংসারে পড়ে আছে। দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সে আরও একলা হয়ে গেল।

কী আছে তার!

সেকেন্ড ক্লাস অনার্স। ফিজিক্স। মনে হলেই যেন কেউ গায়ে তার চিমটি কেটে দেয়। তার ভিতরে জ্বালা ধরে যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

হবে না। এত কম নম্বরে হয় না। যাদবপুর, সিট নেই।

বিশ্বভারতী—মাত্র দুটো সিট।

ভাগলপুর যেতে পারে। বাবা রাজি না।

মার এক কথা, তোকে বলছি না, কমপিউটার কোর্সটা সেরে ফেল।

সে লেগে গেল।

তারপর সে কী করবে!

তারপর সে অগত্যা বিটি পড়ছে। লেসন নোট, প্র্যাক্টিস টিচিং, রুশো, ভলতেয়ার, মন্টেসারি, মায় গান্ধি রবীন্দ্রনাথ কিছুই বাদ নেই। চাকরি! শুধু ইন্টারভিউ, বেশি দূর গড়ালে ভাইবা। ব্যাস হয়ে গেল।

তারপর আর খবর নেই। সে রাস্তার কুকুরটার মতোই খোঁড়া, পর্যদস্তু। পারলে বাড়িঘর সব গুড়িয়ে দিতে চায়। সেকেন্ড ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস বলে একদিন অকারণ চেঁচাতে থাকলে মা ছুটে তার ঘরে ঢুকে গেছে।

তোর কী হয়েছে?

কিছুই হয়নি মা। কিছুই হয়নি!

চেঁচাচ্ছিলি কেন!

জানি না। তুমি যাও মা, প্লিজ আমার ঘর থেকে এখন যাও। সে দরদর করে ঘামছিল।

আর তার জেঠুও আছেন। এসেই এক খবর, সঞ্চারী দুই কইবে!

ওমা জেঠুমণি! কখন এলে।

তোর কী খবর?

কোনো খবর নেই।

আর বাবাও আছেন, বড়দা নরেনবাবুরা আর কোনো খবর দিল!

জেঠুমণি কেমন মুখ ফ্যাকাসে করে হাসবেন। সে কাছে থাকলে সত্যি কথাটা বলবেন না। তবে আড়াল থেকে সে ঠিকই টের পায়, পছন্দ না।-তোকে তাপস এত করে বলেছিলাম, বিয়ে দিয়ে দে। লাবণ্য আছে, রেজাল্টও খারাপ না, এটাই সঞ্চারীর বিয়ের সময়।

মেয়ে রাজি না হলে কী করব বলুন।

এখন মেয়ে ধুয়ে জল খাও। চাকরি করবে, চাকরির বাজার কী বুজিস না। সবই তো বুঝি দাদা। চেষ্টা করছি, এম এস-সি পাস করে যদি কোথাও কিছু জোটাতে পারে। কত আশা ছিল। হল কোথায়। দিনদিন রোগা আর খিটখিটে মেজাজের হয়ে যাচ্ছে। আমার সুপারিশে চাকরি হলে, বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবে–ভয় দেখায়।

জেঠু হা হা করে হেসে উঠেছিলেন, পাগল! পাগল! বিয়ের বাজারেও চল সঞ্চারী। তার কিছুই নেই, কেন নেই এই একটা প্রশ্ন। বিয়ে থা দিলেই কি সব ল্যাঠা চুকে যেত! কেন এত কষ্ট করে পড়া! রাত জেগে, স্কুল কলেজের ভাল ছাত্রী হবার বাসনা। কোনো স্বপ্ন।

সে যে কী, সে নিজেও ভালো বোঝে না। বিয়ে তো শুধু শরীরের কথাই বলে, মন বুঝবে না! লাবণ্য মানে তো শরীরের চটক, এবং বাথরুমে সে তখন দেখেছে নিজেকে বার বার–তারও যে ইচ্ছে হয় না বললে মিছে কথা বলা হবে। খুবই ইচ্ছে হয়। খুব, খুব। এক আদিগন্ত পৃথিবীর মাঝে কোনো সুনিপুণ কারিগর তার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে খুঁজে বেড়াবে, কোথায় গচ্ছিত আছে তার ভালোবাসা। শরীরে শরীর মিশে যাবে। ভালোবাসাও।

লোকটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

আচ্ছা বেহায়া মানুষ তো। বাড়িতে যখন কেউ নেই, চলে গেলেই হয়।

লোকটা যে তার কথাতেই এসেছে তাও সে জানে। তার ঠিক বলাও উচিত হয়নি, কাল সন্ধ্যার দিকে আসুন, মা থাকতে পারে।

থাকবেই সে বলেনি। চৌকোনো মতো একটা কাগজের লম্বা বাক্স কালও সঙ্গে ছিল, আজও আছে। এটাই সে ফিরি করে বেড়ায়। কোম্পানির মাল, কিছুতেই হাত ছাড়া করতে রাজি না। ওজনও যথেষ্ট। প্যান্টশার্ট পরা ফিটফাট যুবক। গলার নেকটাইটা নীল রঙের কেন সে জানে না। নীল রংটা তার পছন্দ না। চুল ব্যাকব্রাশ করা। জানালায় দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় সে সব লক্ষ করেছে। একবার যখন এসেছে না গছিয়ে ছাড়বে না।

সে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। মার জন্য অপেক্ষা করতে পারে। এই রাস্তা দিয়েই ঢুকবে। তার এখন ঘরে ঢুকে বাথরুমে না গেলেই নয়। ঘামে সারা শরীর চ্যাট চ্যাট

করছে। সামনে দেখতে পেলেই ঠিক বলবে, গুড ইভনিং আজ আবার এলাম। আপনি বলেছিলেন, সন্ধ্যার সময় আপনার মাকে পাওয়া যাবে।

ধুত্তোরি গুড ইভনিং, একটুও পাত্তা দেবে না। সে চেনে না এমন ভান করবে। রাস্তায় কত লোকই তো দাঁড়িয়ে থাকে। রাস্তার লোকের খোঁজখবর নিতে তার বয়েই গেছে।

সে হেঁটে গেল লোকটার পাশ দিয়ে।

এই যে, দিদি এসে গেছেন, কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। বাড়িতে কেউ নেই, আপনার মা কি আজও দেরি করে ফিরবেন!

জানি না। বলতে পারত। কিন্তু এই হয়েছে মুশকিল। সে বলতে পারে না। আশ্চর্য রকমের শীতল ব্যবহার করলেও চলে, তাও সে পারে না।

সে গেট খুলে, কোলাপসিবল টেনে ভিতরে ঢুকে গেল। বসার ঘরের দরজা খুলল না, তবে সব জানালা খুলে দিল। লোকটা গেটের মুখে ঢুকে বলল, আসতে ভেতরে।

সে যে কী বলে! যত রাগ এখন মা আর মণিপিসির ওপর। মণিপিসিরও খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, নিজে একটা নিয়েছে, সঙ্গে একটা লেজুড় ধরিয়ে দিয়েছে। কী যে খারাপ লাগছে। অচেনা একজন যুবক, বাড়িতে ঢুকে বসার ঘরে অপেক্ষা করলে তার যে বড়ো অস্বস্তি হয়। দিনকাল ভালো না। খবরের কাগজ খুললে সে বুঝতে পারে কতরকমের রাহাজানি ছিনতাই ধর্ষণের ঘটনা যে ঘটে থাকে। সে ইচ্ছে করলেই একজন অপরিচিত যুবককে বলতে পারে না, আসতে পারেন, আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

তারপরই কেন যে মনে হল লোকটা নির্বোধ, আসতে পারি' বলা তার উচিত হয়নি। একা একটা মেয়ে বাড়িতে, আসতে পারি' বললে কী বোঝায়, তাও কি জানে না! অবশ্য এতসব ভাবনার মধ্যে দরজা খুলে একটা টিনের চেয়ার বাইরে বের করে দিয়ে বলল, বসুন। মা এক্ষুনি চলে আসবে। তারপর সে দরজা বন্ধ করে দিল। সে যথেষ্ট ভদ্রতা করেছে। একজন অচেনা, অজ্ঞাতকুলশীল পুরুষের সঙ্গে এর চেয়ে বেশি ভদ্রতা বজায় রাখা যায় না। বসার ঘরে এনে বসানোও যায় না। পরদা টেনে দিলেই আব্রু ঠিক থাকবে কেন, সে বাথরুমে যাবে, যে কোনো কারণেই হোক বসার ঘর থেকে বাথরুমের জলের শব্দ শোনা যায়। জোরে পাখা চালিয়ে দিলে অবশ্য হাওয়া আর জলের শব্দ মাখামাখি হয়ে যায়। বাথরুমে কী হচ্ছে বোঝা যায় না।

সে বাথরুমে ঢুকে গেল। শরীর থেকে সব খুলে ফেলে শাওয়ার খুলে দিল। কী আরাম! সারা শরীরে সাবান, মুখ উঁচু করে জলের নিম্নগামী ধারার মধ্যে ডুবে যেতে যেতে কেমন মুহ্যমান এক জগৎ, এবং সারা দিনের ক্লান্তি অবসন্নতা ধীরে ধীরে সরে গিয়ে সে সহজেই সতেজ হয়ে উঠতে পারছে।

তখনই ডোর বেল বেজে উঠল। মা বোধ হয় এল!

দরজা খুলে দিলে, মা মেয়েতে ইশারায় বাক্য বিনিময় হয়ে গেল। সেই লোকটা!

ঈষৎ ব্যাখ্যা করে সঞ্চারী সব তার মাকে বলতেই, কৃষ্ণ লাফিয়ে উঠল। ও তাই, আচ্ছা। দরজায় উঁকি দিয়ে বলল, আপনি ভাই ভিতরে এসে বসুন। মণি পাঠিয়েছে, কাল এসে ফিরে গেছেন, পুজোর বাজার!

সোফায় ঢাউস ব্যাগটা তুলে নিয়ে কথাটা বলল কৃষ্ণ।

বসুন। মণির বাড়িতে কবে লাগালেন! মণিকে বলেছিলাম।

বসার ঘরটা একটু বেশি মাত্রাতেই বড়ো। একদিকে সোফাসেট, কোনায় টিভি, বাঁদিকে লম্বা বই-এর র‍্যাক, পাশে পর পর দুটো বড় কোম্পানির ক্যালেন্ডার এবং দেয়ালে লাঠি হাতে সেই চিরাচরিত ভঙ্গিতে চার্লি চ্যাপলিন। ঘরের আর একদিকে একজনের শোওয়ার মতো তক্তপোষ। দামি বেডকভারে ঢাকা একটা পাশবালিশের সাদা রঙের ঢাকনায় রেশমি সুতোর কিছু নকশা। ঘরের তুলনায় জানালাগুলি ছোটো, নেট দেওয়া নীল রঙের নাইলেন, মশার উৎপাত আছে।

সঞ্চারী এখন খুবই হালকা। মা এসে গেছে। তার আর কোনো কর্তব্য নেই। সে নিজের ঘরে ঢুকে আয়নায় দাঁড়াল। চুলে কাঁকুই চালাল। কাঁধের আধ-শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে সামান্য প্রসাধন করল। গোল করে কপালে সুন্দর সবুজ রঙের একটা টিপ পরল। তারপর উরুর কাছটায় ভিজে মনে হওয়ায় লম্বা ফ্রক তুলে বাঁপাটা খাটে রেখে ভিজে জায়গা মুছে দিতেই, মায়ের কণ্ঠস্বর কী রে এসে কিছু খেয়েছিস। শুভদা কিছু করে রেখে গেছে।

কী জানি, দেখিনি।

খেয়েছিস?

না। বাথরুমে মা-র যে বেশি সময় লাগে না, সঞ্চারী ভালোই জানে। তার প্রসাধনের ফাঁকে মা-র সব কাজ সারা। চাও বসিয়ে দিয়েছে। পাউরুটি স্যাঁকা, স্যালাড় কেটে রাখা, ডিমের ওমলেট সবই তৈরি। মা এত কাজের, কে বলবে ভিড়ের বাস ঠেঙিয়ে বাড়ি ফিরেছে। বাবাও বোধহয় এসে যাবেন। তা ছাড়া পে কমিশনের লড়ালড়িও আর নেই। সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর লড়াকু নেতা এখন নিশ্চিন্ত। পুজোর সময়, আত্মীয়স্বজনদের ভিড় থাকেই। কেউ না কেউ রাতে আসে। বাবা বাড়ি না থাকলে তারা যেন হই হুল্লোড়ে মেতে উঠতে পারে না। মামারা তো ভগ্নিপতিটির নামে পাগল। এই হই হুল্লোড়, কখনো তার ভালো লাগে, কখনো লাগে না। আসলে সবাই কাজে কামে ব্যস্ত, অফিস আর ইনক্রিমেন্ট পদোন্নতির কথাও থাকে, এই একটা জগৎ, কোম্পানির কথা, রেলের কথা, এবং বাজারদর, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কোথায় কে পূজার ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছে, কোন কোম্পানির হলিডে হোম, কী সুযোগ-সুবিধা বিস্তারিত তার বর্ণনা। তারাও যায়, বাবার রেলের এ-সি পাস, তাদেরও। সে তো গত পুজোয় দেরাদুন থেকে দিল্লি ফেরার পথে পুরো ছশো টাকা শুধু কোল্ড ড্রিংকসের পিছনেই উজাড় করে দিয়েছিল। আসলে কিছুটা রাগ ক্ষোভ, তার কিছুই হচ্ছে না, সবাই দারুণ সুখী, মা

বাবা দিদি, সবার আর্থিক সঙ্গতি প্রবল, প্রিভিলেজজ ক্লাস। সে সেবারে বাবার কাছ থেকে ছশো টাকা নিয়ে বাবাকেই ফতুর করে দিতে চেয়েছিল। সবাই মিলে তাকে ডিক্লাসড করে রেখেছে—সে ছাড়বে কেন?

তার কত স্বপ্ন, এম এস-সি, থিসিস, স্লেট নেট—সবই ভোকাট্টা। পার্ট টুর প্র্যাক্টিক্যাল তাকে ডুবিয়েছে। পার্ট ওয়ানে এখন ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট, মা তো খুশি হয়ে বাড়িতে বিশাল

গেট টুগেদারে মত্ত হয়ে গেছিল। মা তার কলিগদের, বাবা তার অফিসের বন্ধুদের, আত্মীয়স্বজনরা তো আছেনই, তারপর...তারপর কী!

না, সে আর ভাবতে পারে না। প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষার আগেই অসুস্থ। ছোঁয়াচে রোগ, সারা শরীরে গুটিপোকার মতো জল নিয়ে ফোসকা, কী ব্যথা, আর জ্বর, জ্বরে তারপর বিছানায় শয্যাশায়ী, প্রাক্টিক্যাল পরীক্ষার সময় আলাদা সিটে আলাদা ব্যবস্থা। সে অচ্ছুত হয়ে গেল। অদ্ভুত জীবনের শুরু। কোথাও ঢোকার জায়গা নেই। তার জন্য সর্বত্র নো এনট্রি।

আবার ডোর বেল বাজল।

এই সঞ্চারী, দ্যাখ তোর বাবা বোধহয় এল।

সঞ্চারী বসার ঘরে ঢুকে দরজা খুলে দিল। বাড়িটায় যেই আসে, সামনের বারান্দায় উঠে বেল টিপে দেয়। পেছনে সিঁড়ির পাশের দরজাটা এ-জন্য প্রায় খোলাই হয় না। পেছনের দরজায় এসে ডাকলে, তাকে বসার ঘরে ঢুকতে হয় না। লোকটা দারুণ ভালো মানুষের মুখ নিয়ে বসে আছে। তার দিকে চোখ তুলেও তাকাচ্ছে না। অবশ্য সে জানে লোকটা সবই তার দেখছে, এমনকী তার শরীরের সব ভাঁজগুলো পর্যন্ত। পুরুষ তো নারী-শরীরের অন্তর্যামী। তাদের কাছে কিছুই আড়াল করা যায় না। দামি পোশাকে শরীর ঢেকে রাখার চেষ্টা খুবই হাস্যকর, এটা সে ভালোই টের পায়। আলোর মতো তাপও অদৃশ্য এবং তরঙ্গগামী। উৎস থেকে তরঙ্গের আকারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চারিত হয়। যে-ভাবে তাকে আড়ালে দেখছিল!

সঞ্চারী-ই...।

কেউ যেন দূরে ডাকে।

কে ডাকে! সে বালিকা বয়স থেকেই এই ডাক শুনতে পায়। সে জামা গায়ে দেয়, প্যান্টি খুলে ফেলে, মোজা পরে, পায়ে জুতো গলায়, এবং সে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে থাকলে, এই অধীর অচেনা কণ্ঠস্বরে সে বিচলিত বোধ করে। কেউ তাকে ডাকে, বড়ো হতে বলে। সে মাঝে মাঝে বড়ো হবার জন্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে—এবং কিছু আভাস শরীরে ফুটে উঠতে থাকলে, সে বোঝে এরই নাম বড়ো হওয়া। প্রকৃতির অমোঘ ইচ্ছে শরীরে কারুকার্য তৈরি করছে। প্রকৃতির কূট কামড়ে সে এখন বিছানায় শুয়ে প্রায়ই সেই রহস্যময় পুরুষকে খুঁজে বেড়ায়।

বাবাও ঢুকে বললেন, ও এসে গেছেন, বসুন।

তারপর পরদা তুলে ডাইনিং স্পেসে হাতের ব্যাগটা টেবিলে রেখে দিলে মা বলল, চা দেব! হাত মুখ ধুয়ে নাও।

আচ্ছা এরা কী! লোকটার সঙ্গে কেউ আর কথা বলছে না। নেওয়া হবে কি না তাও বোধহয় ঠিক নেই। সঞ্চারী খুবই অস্বস্তি বোধ করছে।

মা বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, কথা বলো।

তুমি বলো না।

কত দাম বলছে!

ওতো বাজার দর—কত বলার কী আছে। সাতে পাঁচ হাজার।

লোকটিকে এক কাপ চাও দেওয়া যায়। অন্তত বসার ঘরে চুপচাপ বসে না থেকে চা খেতে পারে। তার নিজেরই গায়ে কেমন জ্বালা ধরে যাচ্ছে। ভিতরে বসে তারা চা জলখাবার খাচ্ছে, লোকটিকে বসিয়ে রাখার কোনো মানেই হয় না।

সে না বলে পারল না, তোমরা ওর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নাও। কতক্ষণ বসে।

থাকবে।

বলছি, দাঁড়া। একটু জিরোতে দে। বলেই বাবা ঘর থেকে পরদা তুলে বললেন, এই যে ভাই, বড়ো সকাল সকাল এসে গেছেন। মণিদি তো জানে আমার ফিরতে রাত হয়। ছুটির দিনে আসতে পারতেন। একটু দেরি হবে। আমরা ফ্রেশ হয়ে আসছি। কোথায় থাকেন?

হাওড়ায়। ওরে বাব্বা, সে তো অনেক দূর।

আজ্ঞে, তবে অসুবিধা হবে না। ও নিয়ে ভাববেন না। পরদার ফাঁক দিয়ে সপ্তারীও দেখল, কেমন কুঁজো হয়ে বসে আছে লোকটি। লোকটি না ভেবে যুবক ভাবা যেতে পারে। তারই বয়সী, কিংবা কিছু বড়ো হতে পারে, সরু গোঁফ, কালো, বেশ কালো রঙের মুখে এত কালো গোঁফ মানায় না। বড় বেমানান। সে কেন যে ফিক করে হেসে দিল।

বাবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, এবং কথাবার্তায় বড়োই বিগলিত ভাব। সেলসম্যানশিপ। ব্যবহারে যদি ভজে না যায়, তবে কপালে দুঃখ থাকতে পারে। একটু বেশি মাত্রাতেই আজ্ঞে আমি করছে। ভদ্রলোকের কপালে আজ বেশ দুঃখ আছে। তার বাবাটিকে তো জানে না। সব কিছু বাজিয়ে নেবার স্বভাব। এত বৈষয়িক যে জীবনেও ঠকতে রাজি না।

বাবা পরদা ফেলে দিলে, কালো মানুষ, কালো গোঁফ নিমেষে অদৃশ্য।

সঞ্চারীর কেন জানি চা খেতে ভালো লাগছে না। সে চা ঠেলে দিয়ে উঠে। পড়ল। খাবার কিছুটা খেল, কিছুটা পড়ে থাকল।

বাবা বললেন, কী হল, উঠে পড়লি।

তোমরা খাও। আমার খেতে ভালো লাগছে না।

শরীর খারাপ!

না।

জানি না।

সঞ্চারী চায়ের কাপ বেসিনে রেখে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। কেমন অভব্য মনে হচ্ছে। সব ঠিকঠাক থাকলে বোধহয় এমন হয়। অন্যের মান অপমান বুঝতে চায় না। দুদিন ধরে ঘুরছে, সে জিনিস গছাতে এসেছে, এটাই তার কাজ।

হাওড়ায় বাড়ি, বাসে কী ভিড় সে নিজেই টের পায়। না এটা ঠিক না। মা কার, কার পূজার বাজার এখনও বাকি, বাবাকে সেই ফিরিস্তি দিচ্ছে। বাবা মার এমন আচরণ সে পছন্দ করে না। এত চেষ্টা করছে, একটা তার চাকরি হল না! সে বেকার। এই জ্বালা থেকেই বোধহয় ভদ্রলোকের ওপর সে একটু বেশিমাত্রায় সহৃদয় হয়ে পড়ছে।

এটাই তার দোষ।

বেকার না থাকলে, খোঁড়া কুকুরটার জন্য বোধহয় এত মায়া হত না। জীবকুলের সর্বত্রই ছড়ানো-ছিটানো হেয়জ্ঞান বিরাজ করছে। তাদের এই বয়সটাকে কেউ বুঝতেই চায় না। মেয়ে যখন, বিয়ে দিলেই রেহাই। বিয়ে, তারপর এক পুরুষ এবং পুরুষের বিছানা, তার জাতকের জন্য প্রস্তুত থাকা, তাকে বড়ো করা, মেয়েমানুষের আবার কী চাই। জানালার পরদা ঠিক আছে কি না, সতর্ক থাকলেই হল।

মানছি না, মানব না। সে কেমন স্লোগান দিতে যাচ্ছিল। তোমাদের টাকা, তোমাদের বাড়ি, আমি কেন অনুগ্রহ নিতে যাব। তারপরই মনে হল, না মাথাটাই তার খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তার আজকের প্র্যাক্টিস টিচিংও ভালো হয়নি। বি টিতেও সেকেন্ড ক্লাস। স্যারেদের উমেদারি সে একদম করতে পারে না। সবাইকে চতুর এবং সুযোগসন্ধানী মনে হয়।

তখনই সবার ঘর থেকে বাবা ডাকলেন, সঞ্চারী শুনে যা। জিনিসটা একবার দেখবি না। তোরই পাল্লায় পড়ে কিনছি। তোর বন্ধুদের বাড়িতে অনেকের আছে, আমাদের থাকবে

না, হয় কী করে। তোর মাও চাইছেন, তাঁর বন্ধুদের বাড়িতেও অনেকের নাকি আছে। জল এখন পরিত না করে খাওয়া ঠিক না।

পরিশ্রুত কথাটাতে সঞ্চারীর মুখ বেঁকে গেল। পরিশ্রুত না ফুটানি, সবার আছে। সবার আছে বলতে কারা! সবার কথাটা কত ব্যাপক বুঝবে না। সবার থাকে না, কিছু লোকের থাকে। বাবা-মা সেই কিছু লোকের মধ্যে। তাকে ডাকছে।

সে বলল, আমার আবার দেখার কী আছে! তোমরা কিনবে, তোমাদের পছন্দ হলেই হল।

বারে, একবারই তো কেনা হবে। দেখে নিবি না।

তোমরা দ্যাখো।

তখনই দরজায় মা পরদা ফাঁক করে বলল, আয় না। লোকটা কতক্ষণ বসে থাকবে।

সঞ্চারী এর পর আর নিজের ঘরে বসে থাকতে পারল না। তার পছন্দ না হলে সে কিনবে না, এমনও কথা নেই। তবে এই নিয়ে জল ঘোলা হোক সে চায় না। তার জন্য লোকটার দেরি হোক সে চায় না।

বাবার গলা পাওয়া গেল।

এত দেরি কেন রে।

সে শাড়ি পরছে। এবং মুখ আয়নায় দেখছে। পাফে সামান্য পাউডার মুখে ঘসে দিল। চুল দু-একটা এলোমেলো হয়ে কপালে উড়ছে। সে বের হয়ে বেশ পরিপাটি করে লোকটার পাশে না বসে বাবার পাশে গিয়ে বসে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে যুবকের মুখ প্রত্যাশায় গাঢ় হয়ে গেল। সঞ্চারীর নজর এড়াল না। বড়ো সবিনয়ে বাক্স খুলতে গেলে সঞ্চারী বলল, খুলতে হবে না। ও আর দেখার কী আছে। আপনাদের কোম্পানির খুবই সুনাম।

আবার ডোর বেল।

দ্যাখ তো কে এল! বাবা তার দিকে তাকিয়ে কথাটা বললেন।

মা বলল, চেক দেব কিন্তু।

তা দিন। চেকই নিয়ে থাকি। অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক।

তাই দেবার নিয়ম। সে এবার বাক্স থেকে পরিশ্রুত জলের মেশিন এবং তার লটবহর টেনে বের করতে থাকল।

ও মা জেঠুমণি।

জেঠুমণি ঢুকতেই বাবা বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। কোথায় বসায়! ঘরে এ দিকের পাখাটা চলছে। ও দিকের পাখা চালিয়ে বলল, বড়োদা এখানটায় বসুন।

সঞ্চারী দেখল জেঠুমণি মেশিনের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরালেন কুঁজো হয়ে বসে থাকা যুবকটির দিকে তারপর মা এবং বাবা, শেষে দেয়ালের ছবি, এবং ছাদের পাখাও বাদ দিল না।

বললেন, তোমারও দেখছি খপ্পরে পড়ে গেছ।

আসলে উক্তিটি বউমার প্রতি না বাবা, না তারা সবাই সঞ্চারী বুঝতে পারছে। জেঠুমণির এই কথাটাই যে সব কেঁচিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। সঞ্চারী এটাও বোঝে। এবারে জেঠুমণি পাখার নীচে শশাফায় বসতে বসতে বললেন, কতদিনে পাকড়ালে হে ছোকড়া। ঠিক জায়গাতেই এসে গেছ।

না স্যার, পাকড়াব কেন। এটা তো ফ্যামিলির পক্ষে খুবই জরুরি।

বাজে কথা। বছর খানেক আগে আমার বাড়িতেও গছিয়ে দিয়ে গেছে। কোনো কাজ হয় না। সাধারণ ফিল্টারেই কাজ চলে। যাই বল এতে ভাইরাস কিছুতেই আটকায় না।

বাবাও গোঁ ধরলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু বাড়ির সবাই চাইছে, আমার তো একদম ইচ্ছে ছিল না।

সঞ্চারী এবার আর পারল না।

একদম মিছে কথা বলবে না বাবা। সবাই চাইছে মানে। আমি কখনো বলেছি কিনতে।

বলিসনি, তবে কেউ কিছু কিনলেই বাড়িতে এসে কে সাতকাহন করে বলে, বল।

আমি বলি না। তোমাদের পছন্দ হলে কিনবে, না হয় কিনবে না। আমাকে এর মধ্যে জড়াবে না বলে দিলাম।

জেঠুমণি বললেন, আরে রাগ করছিস কেন। সঞ্চারী দেখল, মা গুম হয়ে বসে আছে। একটা কথাও বলছে না।

জেঠুমণি কিছু একটা আঁচ করতে পেরে বললেন, কেনার যখন ইচ্ছে হয়েছে কিনে ফেল। কত টাকাই তো জলে যায়।

যুবকটি এতক্ষণ হাবলার মতো তাকিয়ে ছিল, এবারে সে বলল, দেখুন স্যার একটা কথা বলব, কিছু যদি মনে করেন। আমাদের মালে লাইফ লং সার্ভিস, আমার কোম্পানির মাল হলে ঠিকানা দেবেন, আমি নিজে মিস্ত্রি নিয়ে এসে ঠিক করে দেব।

ও সবাই বলে, কল দিলে পাত্তাই পাওয়া যায় না। ছ মাসও গেল না। বড়ো বড়ো কথা সবাই বলে—সকাল নটা থেকে শুরু—আসছে, যাচ্ছে। দরজায় বেল বাজছেই। কাঁহাতক দরজা খোলা যায়। আমরা স্যার বিজনেস ম্যানেজমেন্ট থেকে এসেছি, কী সাবান ব্যবহার করেন, কেন করেন, এই সবের ডাটা সংগ্রহে এসেছি। শেষে যা দাঁড়ায় ঝুলি থেকে বিড়াল, একটা শ্যাম্পেল মাল রাখুন, দাম দিতে হবে না। এই তো ভাই তোমাদের চেহারা। দুপুরে ঘুমাতে পর্যন্ত পারি না। বেচু পার্টিরা অতিষ্ঠ করে মারছে। এক তলায় থাকার এই একটা বিড়ম্বনা।

সঞ্চারীর খুবই খারাপ লাগছে। মা-র দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা কি কিনবে?

কেন কিনব না!

বাবা বললেন, সেই, কেন কিনব না। ভাইরাস থাকে থাকুক।

যুবকটি বলল, ব্যবহার না করলে বুঝতে পারবেন না, কত দরকারি জিনিস।

ভাইরাস মরে না কে বলেছে! কত উন্নতি হচ্ছে সবকিছুতে। ভিতরে আলট্রা ভায়োলেট রে দিয়ে ভাইরাস মেরে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বাজারের আর দশটা মালের সঙ্গে স্যার গুলিয়ে ফেলবেন না।

জেঠু বললেন, দ্যাখো ভাই আমি তো কিনছি না, কিনবে এঁরা।

সঞ্চারী দেখল, মা যেন কিছু বলতে চাইছে।

বলল না কী বলতে চাও।

লাইফ লং সারভিস বলছেন? যুবকটির দিকে মা তাকিয়ে থাকল।

হ্যাঁ মাসিমা।

কিন্তু কমপ্লেন আছে। আমার বন্ধুরা আপনার কোম্পানির মালের খুবই সুখ্যাতি করেছে। তবে একটাই মুশকিল, মাঝে মাঝেই খারাপ হয়ে যায়। কল দিলে কেউ তখন আসতে চায় না।

কল চার্জ দিলে আসবে না কেন মাসিমা? সঞ্চারী নিজেও কেমন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে।

আমি উঠছি মা।

সঞ্চারীর কেন যে মনে হচ্ছে, যুবকটি বাড়িতে ঢুকে চোরের দায়ে ধরা পড়েছে যেন। সে বিরক্ত গলায় বলল, আপনার কী নাম!

অমিত সেন।

আপনারা কেন আসেন বুঝি না। কী দরকার আসার। কী দরকার এত খোশামোদ করার। দু-দিন ধরে ঘুরছেন।

যুবকটি অবলীলায় বলল, দরকারে দু-দিন কেন বছরের পর বছর ঘুরতে পারি। আমাদের এটাই তো কাজ।

তা হলে ঘুরুন। সঞ্চারী আর একটাও কথা বলল না। রাগে ফুঁসছে। সে ভিতরে ঢুকে গেল। তারপর যা হল, মা বাবাকে দুষছে। বাবা মাকে দুষছে। কার অ্যাকাউন্ট থেকে চেক কাটা হবে, সেটা এই মুহূর্তে দিলেও দু-দিন বাদে ব্যাংকে জমা দিতে হবে। তাতেও রাজি। বাবার কথা, এক সঙ্গে এত টাকা দেওয়া ঠিক না। বরং ইনস্টলমেন্টে কেনা ভালো।

ইনস্টলমেন্টে কিনলে লাইফ লং সার্ভিসের গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না, যুবকটি ক্যাটালগ খুলে তাও দেখাল।

পরদার ফাঁক দিয়ে সঞ্চারী দেখতে পেল, যুবকটির মুখ ক্রমে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

বাবার কথা, চেক দিলে, মেশিনটা রেখে যেতে হবে। এবং দেয়ালে জুড়ে দিতে হবে। তারপর ব্যাংকে চেক জমা যাবে। কে ঘুরবে ভাই তোমাদের পেছনে।

যুবকটি বলল, ঠিক আছে পরশু দেবেন চেক। পরশু আসব। বলে সে বেশ ভারী জিনিসটি হাতে ঝোলাতে গেলে, জেঠুমণি বলল, এটা রেখে যান। এতটা রাস্তা আবার টেনে নিয়ে যাবেন। কষ্ট হবে। বাসের যা অবস্থা।

না, নিয়ম নেই। পেমেন্ট এগেনস্ট ডেলিভারি। তারপর জেঠুমণির দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার আমাদেরও বাবা-মা আছেন। আমাদেরও পুজো পার্বণ সবই আছে। ভাইবোনেরা দাদার আশায় থাকে। ফিরতে ফিরতে কত রাত হবে জানি। সল্ট লেকের ডিপোতে মাল জমা দিয়ে, কত রাতে কোন বাসে যাব তাও ঠিক জানি না। আমি না ফেরা পর্যন্ত বাড়ির সবাই জেগে থাকবে।

সঞ্চারী আর পারল না নিজেকে দমন করতে। সে বসার ঘরে ঢুকে চিৎকার করে বলতে থাকল, কেন আপনারা আসেন, এঁদের আপনি চেনেন না। এরা সব পেয়ে গেছে। কেউ দরজায় এসে দাঁড়ালে এদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে।

বাবা অবাক চোখে সঞ্চারীকে দেখছে। সঞ্চারী এত ক্ষিপ্ত হয়ে কখনো কথা বলে না।

আরে তোর এত রাগের কী হল! তুই খেপে যাচ্ছিস কেন। আমরা কতটা কী করতে পারি।

কতটা পারো, জানি না বাবা, যতটুকু পারি তাও আমরা করি না। সিঁড়ি ধরে নামার সময় সঞ্চারী বারান্দার আলো জালিয়ে দিয়ে বলল, অমিতবাবু, সাবধানে নামবেন। সিঁড়ির এ-জায়গাটায় অন্ধকার আছে। একটা গর্তও আছে। পড়ে-উড়ে পা খোঁড়া হলে পঙ্গু হয়ে যেতে পারেন। কে দেখবে তখন।

লোকটি পেছন ফিরে তাকাল। সঞ্চারী কেন যে মুখ ফিরিয়ে নিল। ধরা পড়ার ভয়ে, না অন্য কিছু।